# গুরুশিষ্য পরম্পরা

## প্রাণবন্ধু কই গো

স্বপন বসু

রণেনদা আমার কে! কয়েক কথায় গুছিয়ে বলা খুব মুশকিল। যেন জন্মে থেকেই আমি রণেনদাকে জানি, যেন আমার পরমাত্মীয়। এখনও রণেনদার কোনো গান গাইলে—রণেনদাকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

রণেনদার গান, মানে রণেনদার গাওয়া গান —সে তো রণেনদার নয়, হয়তো প্রচলিত নয়তো কোনো পল্লী-কবির রচনা। কিন্তু রণেনদা যখন গাইতেন তখন গানের কথাগুলো যেন তাঁর মনের কথা হয়ে উঠতো। একটা গানকে যে কতো যত্ন করে, কতো আদর করে গাওয়া যায় তা রণেনদার গান যারা সামনে বসে শুনেছেন তাঁরা জানেন।

রণেনদাকে নিয়ে কোনো আলোচনা কালিদাকে ছাড়া বা কালিদাকে নিয়ে কোনো আলোচনা রণেনদাকে ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। অন্তত আমার কাছে। কালিদা ও রণেনদা দুজনকেই আমার এক সঙ্গে পাওয়া। সেই এসপ্ল্যানেড ইস্টের বন্দিমুক্তি সভায়। তখন আমি কলেজে পড়ি আর থিয়েটার করি।

'নমাজ আমার হইল না আদায়'—রণেনদার গলায় সেই প্রথম শোনা গান আমার সারা শরীরে যে কি শিহরণ জাগিয়ে দিল আমি বলে বোঝাতে পারব না। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। গানের মানেটা পুরো উদ্ধার করতে পারলাম না, কিন্তু একটা তাজা গান। আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা প্রথম। শুধু একটা গান নয়—যেন হাজার হৃদয়ের কথা। তথাকথিত গণসঙ্গীতেও এভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় না।

সটান চলে গেলাম ওনার কাছে। 'দাদা অসাধারণ লাগল আপনার গান'। দেখলাম হঠাৎ করে উনি কেমন সংকুচিত হয়ে গেলেন। আমারও যেন কেমন একটু লাগল, কি রে বাবা আমি কি কোনো ভুল করে ফেললাম! প্রশংসা করলে যে কেউ এমন অস্বস্তি বোধ করতে পারে জীবনে প্রথম দেখলাম। তারপর আরও অবাক হলাম। যখন বললাম 'দাদা এই গানটা ...মানে গানের মানেটা...মানে আপনি যদি শেখান...' আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমি গান শিখাই না'। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কালিদাকে দেখিয়ে (একটু দুরেই কালিদা বসেছিলেন) বললেন 'যদি সিরিয়াসলি গান শিখতে চাও তবে কালিবাবুর সঙ্গে যুগাযুগ কর্-অ'। বুঝে গেলাম লোকটা একশো ভাগ খ্যাপা, সিম্পলি আমার ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন।

কালিদা গাইবেন বলে মঞ্চের পাশেই বসেছিলেন। দেখেই মনে হচ্ছিল দীর্ঘকাল বিদেশে কাটানো একজন বিশিষ্ট বাঙালী। ভেবেছিলাম বোধ হয় গীটার হাতে বিদেশী গান-টান শোনাবেন। কিন্তু যখন মঞ্চে উঠে দোতারা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান ধরলেন, আমি চমকে

গেলাম।

আমার এখন মনে হয় আমি যেন এ সময়টার জন্যই অতদিন বসেছিলাম। আমার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ যেখানে রণেনদা আর কালিদাকে একসঙ্গে পাওয়া। কালিদা অচিরেই বুঝে গেলেন যে আমি এক গান-হ্যাংলা ছেলে। রোদ-বৃষ্টি, জল-ঝড়ে যদি একজনও কেউ ক্লাসে হাজির হয় সে আমি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই কালিদা আমার হাতে তুলে দিলেন সেই উত্তরবঙ্গের দোতরা। সে এক অভুতপূর্ব মুহূর্ত। যেন মনে হয় বললেন, 'এই নাও তোমার যাদুকাঠি। এই যে চারটে তার —এখানেই সুর আর এখানেই ছন্দ, এবার বুঝে নাও। এই বোঝা সারা জীবনের।'

কালিদার বাড়ীতে রণেনদাকে নিয়ে অনেক টুকরো স্মৃতি। অসাধারণ রসবোধ রণেনদার। কোনো দিন হয়তো এমন হয়েছে যে গড়িয়াহাটের দিকে কোনো কাজে গিয়েছি, কি মনে হল, কালিদার একডালিয়ার বাড়ীতে ঢুঁ মারলাম। গিয়ে দেখি কালিদা বেশ কিছু অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন আর সেখানে রণেনদাও রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই একটু দেখা দিয়েই বেরিয়ে আসা উচিত, কারণ বড়োদের আড্ডায় ছোটদের থাকতে নেই। ছোটবেলায় বড়োদের কাছে শেখা। কিন্তু কালিদা যথারীতি —'আরে বোস বোস। এক্ষুণি এলি। কোথায় যাবি' বলে সকলে সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমিও ঘাপটি মেরে বসে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোজান বৌদি একটা ট্রের মধ্যে অনেকগুলো চায়ের কাপ-সহ হাজির । আমরা সবাই নীচে মাদুরে বসেছিলাম, হঠাৎ রণেনদা রোজান বৌদির দিকে দুটো হাত তুলে উদার গলায় ধরলেন 'কি ধনে শুধিব তোমার ঋণ গো রাধে। রাই আমার সে ধন নাই।' বৌদি তখন ট্রে হাতে নিয়েই বসে গেলেন।

রোজান বৌদির কথা আলাদা করে বলতেই হয়। একজন শিক্ষিকা সারাদিন স্কুল করে, বাড়ীতে টিউশন করে নানা পরিশ্রমের মাঝেও এতো উৎসাহ —ভাবা যায় না। কালিদার বাড়ীতে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যের কোনো বালাই ছিল না। যে কোনও সময় অবারিত। এ ব্যাপারে কালিদার মামাবাড়ীর কোনো তুলনা হয় না। এই রকম মামা বাড়ীও ভাগ্য করে পেতে হয়। রোজান বৌদিকে কোনো দিন এতটুকু বিরক্ত বোধ করতে দেখিনি। বরং ক্লাসের দিনে বৌদিকে দেখে মনে হোতো যেন এই বিশেষ দিনটার জন্যই সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে আছেন। একজন মানুষ তার দেশ ছেড়ে, পরিজন ছেড়ে সুদূরে আরেকটা মানুষের জন্য ভালবেসে এমন আত্মত্যাগ সিনেমায় দেখা যায়।

রণেনদার বেলঘড়িয়ার বাড়ীতে আমার খুব কমই যাওয়া হোতো, আর তাছাড়া বাড়ীতে রণেনদাকে যেন ঠিক ফর্মে পাওয়াও হোতো না। আসলে রণেনদাকে আমরা ঠিক যে ভাবে পেয়ে অভ্যস্ত ঠিক সে ভাবে। বৌদিও চাকরী করতেন। ছুটির দিনেই যেতাম। সবার সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতো, আড্ডা হোতো। আমার এমন কোনো দিন মনে পড়ে না যেদিন বৌদি আমার কিছু না খাইয়ে আর কিছু না গাইয়ে ছেড়েছেন। বাড়ীর সকলেই খুব অতিথি পরায়ণ। আর গাছ-গাছালি ঘেরা রণেনদার বাড়ীর পরিবেশটাও ছিল খুব আন্তরিক, যেন দ্যাশের বাড়ী। নানা রকম পাখি এসে গাছের ডালে বসতো। শুনেছি রণেনদা ভোর বেলা একা একা চুপ করে বসে পাখির ডাক শুনতেন আর নিজের মনে গুনগুন করতেন। সংসারে থেকেও ভাবুক

সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করে গেছেন রণেনদা। বাবার প্রতি মেয়েদের গভীর ভালবাসা আর বৌদির নীরব প্রশ্রয় না থাকলে এ সম্ভব হোতো না।

আর একজন। রণেনদার দাদা রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী। একেবারে যেন রণেনদার আর একটা সংস্করণ। ভাইয়ে ভাইয়ে এতো মিল আমি এর আগে দেখিনি। চেহারার মিলের কথা বলছি না। বলছি মানসিকতার কথা যা যমজ ভাইয়েও থাকে না। সেই হাসি, সেই ভালবাসা, সেই খেয়ালীপনা। প্রথম দেখাতেই মনে হয় যেন কত দিনের চেনা। রণেনদার ছিল গান আর দাদার ছিল ছবি। বেশ কটা ছবি এঁকে আমার দিয়েছিলেন। এখনও আছে আমার কাছে।

রণেনদাকে নিয়েই লেখার শুরু, কিন্তু রণেনদার মতো মানুষকে নিয়ে লিখতে গেলে তাঁর চারপাশের কাছের মানুষেরা যেন এসে ঘিরে ধরেন। যাঁদের আঁকড়ে ধরে রণেনদার পথ চলা। মন নেই এমন মানুষের সঙ্গে রণেনদার একেবারেই বনতো না। একান্ত খুব কাছের কিছু প্রিয় মানুষের সঙ্গে থাকতেই ভালবাসতেন রণেনদা। তাই তিনি সেই অর্থে জনপ্রিয় না হয়ে কিছু প্রিয়জনের মানুষ হয়ে চিরকালের জন্য আমাদের কাছে রয়ে গেলেন।

কালিদার ক্লাসের শেষে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় রণেনদা এসে হাজির। 'এতো রাইতে কেনে ডাক ছিলি প্রাণ কোকিলারে'— যেন এক দমকা হাওয়া। কোথা থেকে আসে এই আওয়াজ। যেন একই কণ্ঠে হাজার হৃদয়ের কথা। নিমেষে সম্মোহিত করে দেয়।

আগে আমরা অনেকেই ভাবতাম যে রণেনদার মধ্যে কি কোনো অলৌকিক ব্যাপার-ট্যাপার আছে, না কি। কোনো রকম রেওয়াজ বা গলা সাধার ব্যাপার নেই। অথচ অবলীলায় গান গাইছেন। এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভাবতাম আর অবাক হতাম। তার ওপর রণেনদা বিড়ি খেতেন। মাঝে মাঝে স্মোকিং কাশিও হতো। শেষের দিকে মাঝে মাঝে ঠান্ডা লেগে একটু ব্রঙ্কিয়াল সমস্যাও হতো। এতো কিছু সমস্যার মাঝেও যখন গান ধরতেন তখন কোথায় কি। রণেনদাকে দেখেই বিড়ি খাওয়া ধরলাম, ভাবলাম এর মধ্যেই বোধ হয় কোনো রহস্য আছে। নইলে একটা মানুষের গলাটলা সাধার কোনো বালাই নেই অথচ এ জোয়াড়ী আর তিন সপ্তকের অনায়াস স্বরক্ষেপণ। কিন্তু আমার বিড়ি যাওয়াই সার হল, আসল রহস্য উদঘাটন হলো না। ঐ যেমন করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে অনেক উঠতি কবি বাংলা ধরল, কিন্তু বাংলা কবিতা লেখা হলো না।

এখন বুঝি সঙ্গীত চর্চাটা শুধু কণ্ঠের নয়, মস্তিষ্কেরও। আর মস্তিস্কই জোগায় ভাবনা। ভাবনা ছাড়া কোনো শিল্প-চর্চাই সার্থক নয়। সুরে তালে মিললেই কি গান? কত গায়কই তো গান গায়। কজন হৃদয় ছুঁতে পারে। ভাবনার সঙ্গে যার চর্চা সেই প্রকৃত সাধক। শুধু কণ্ঠ চর্চা করে একজন গায়ক হওয়া যায়, সাধক হওয়া যায় না। একজন প্রকৃত সাধক একটা পরিণত বয়সে পৌছনোর পর তখন তার সঙ্গীত সাধনা আর ক্ষণিকের থাকে না। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে যায়। তখন গুন গুন করে গাওয়াটাও তার সাধনা। তখন সে পাখির ডাকের মাঝেও তার গানের সুর খুঁজে বেড়ায়।

রণেনদাকে একজন গায়ক না বলে একজন সাধক বলা ভালো। একজন গায়ক বা একজন পারফরমারকে অনেক বেশী চৌখস ও সচেতন হতে হয়। এবং একজন প্রফেশনাল পারফরমার হিসেবে সেটাই সঙ্গত। যেমন সাউন্ড টেকলোনজি সম্পর্কে অবগত থাকা, আলোর ব্যবহার

জানা, শ্রোতার মনস্তত্ত্ব বোঝা। যেমন একজন অভিনেতার ক্ষেত্রেও — স্টেজের আলো ফলো করা, তার সহঅভিনেতার ডায়ালগ ফলো করা, মানে যদি তাকে একজন পাগলের ভুমিকায় অভিনয় করতে হয়, তা হলে তার একজন আদর্শ সেয়ানা পাগল হওয়া খুবই জরুরী।

রণেনদা কিন্তু সেই অর্থে পারফরমার নন। প্রফেশনাল তো ননই। শুধুমাত্র একজন গায়কও নন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক যিনি তাঁর সাধনায় সর্বদা বুঁদ হযে আছেন। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেও সে দিকে নজর থাকতো না রণেনদার। অ্যাকমপ্যানিস্টরা কে কি বাজাচ্ছে সে দিকেও নজর নেই। যেন 'আমার বুঝে চলতে পারলে ভালো, না পারলে আরও ভালো'। আমার তো মনে হয় কোনও রকম অনুষঙ্গ ছাড়া খালি গলায় গান গাইতেই রণেনদা বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। রণেনদার যে ক্ষ্যাপামো, চোখ বুজে গাইতে গাইতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যেতেন যেখানে হিসেব মেনে চললে হয় না। যদি আলো দেখি, অডিয়েন্স দেখি—তা হলে এ অতীন্দ্রিয় জায়গায় পৌঁছনো যায় না। আমি নিজেকে দিয়েই বুঝি। এমন অনেক গান আছে যেগুলো বেশীর ভাগ সময় মঞ্চে গাইতে পারি না, কিন্তু নিজের জীবনে গানগুলো আমার খুব আদরের। মঞ্চে গাইতে গেলেই মনে হয়, এর সঙ্গে আমার গভীর জায়গাটা হয়তো মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে পারব না। তাই অনেক আসরেই শ্রোতার প্রতিক্রিয়া বুঝে অনেক সময় গানের নির্বাচনও পাল্টাতে হয়। রণেনদার মতো মানুষ কিন্তু এসবের তোয়াক্কা করতেন না। এখানেই একজন সাধক আর একজন গায়ক বা পারফ-রমারের তফাৎ।

রণেনদার কাছে গানটা শুধুই একটা গান নয় একটা ism। Ism মানে political ism এমন নয়। একটা দর্শন। ওঁর গানের নিমগ্নতায়, ওঁর তন্ময়তায় মনে হয় যেন একজন দার্শনিক গাইছেন। গ্রামের একজন প্রকৃত বাউল যখন গায় তখন তাকে কিন্তু একজন দার্শনিকই মনে হয়। তখন সে তার গানের মাঝে তার অন্তরাত্মা, তার বিশ্বাসকেই প্রকাশ করছে। 'ঘরের কাছে আরশি নগর এক পড়শি বসত করে'—এই বিশ্বাস গভীরে নিয়েই তার গানের প্রকাশ। রণেনদা যখন গান 'কি ধনে শুধিব তোমার ঋণ গো রাধে, রাই আমার সে ধন নাই'— সেটা তখন ওঁর মনের কথা, সেটাই বিশ্বাস।

বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষেরা বলেন শিল্পীকে তার শিল্পের বাইরে খুঁজতে নেই। যেমন রবিঠাকুরের কথায় 'কবিরে খুঁজো না তার জীবনচরিতে'। কিন্তু রণেনদার মতো মানুষের সঙ্গীতসত্তাকে কোনও ভাবেই তাঁর জীবনের থেকে আলাদা করা যায় না। তাই সেই অর্থে তিনি একজন শিল্পী নন, একজন সাধক, যাঁরা গানটাকে একটা বিশ্বাসের জায়গা থেকে দেখেন। যাঁদের জীবনটাই একটা দর্শন।

'আমার কালো পাখি গেলো উড়েভালবাসার শিকল ছিঁড়ে'— এই গানটা রণেনদার কাছেই শেখা। কিন্তু রণেনদা যখন চলে গেলো মনে হল যে কালো পাখি সে-ই। যেন আমার ভালবাসার শিকল ছিঁড়ে চলে গেলো। এইভাবে একটা গানকে জীবনের করে দেখা—এই দেখাটাও তো রণেনদাকে দেখেই শেখা। দু'শ তিনশ বছরের পুরোনো গানও কি ভাবে সময়ের হয়ে যায়।

কালিদার কাছে আমি সাত-আট মাস শিখেছি। মানে ক্লাসে গিয়ে শেখা আর কি। কালিদা সেই সময় হঠাৎ বিদেশ চলে গেলেন। তারপর ফিরে আসার পর নানা কারণে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রণেনদাকে ছাড়া তো তখন আমার একেবারেই চলছে না। একেবারে চৈতন্য প্রেমে মজে আছি।

'আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিবাই কেমন করে—
তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে—
দেখনা তোরা হৃদয় এসে
দেখনা তোরা হৃদয় ছিঁড়ে...'

যে মানুষটা বুকে হাত দিয়ে বলে 'হৃদয় চিরিয়া তুমারে ভরিয়া, রাখিমু সিলাইও করি'—তাকে কি করে ভুলি!

রণেনদার কাছে আমার গান শেখার ধরণটাও ছিল অদ্ভুত রকম। প্রায় দিনই অফিসে চলে যেতাম। কোনো দিন হয়তো একটা গান লিখলাম, কোনো দিন হয়তো শুধুই শুনলাম। আসলে রণেনদার কাছে থেকে গান শিখেছি যত, শুনেছি তারও বেশী। রণেনদার গান খুব কাছ থেকে শোনাটা একটা অভিজ্ঞতা। অসাধারণ গায়নভঙ্গী, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে তাকতাম। ভুলেই যেতাম গানটা শেখার কথা। মনে হতো আবার শুনি, শুধুই শুনি।

কোনো কোনো দিন হয়তো কোনো গানই হল না। নানা রকম গল্প হল হয়তো। পুরোনো দিনের গণনাট্যের সময়ের নানা অভিজ্ঞতার কথা, রাজনৈতিক জীবনের কথা—সেই সময় জেলখানায় কাটানো দিনগুলোর কথা। কত অচেনা অজানা মানুষের কথা।

কোনো দিন হয়তো বিটি রোডের ধারে কোনো ধাবার সান্ধ্য খাটিয়ার বসে গান। কখনও বরানগর স্টেশনে কোনো এক নিঃঝুম দুপুরে বেঞ্চে বসে গান। কোনো দিন হয়তো অফিসের পরে কথা বলতে-বলতে হাঁটতে-হাঁটতে শেয়ালদা স্টেশন। শেয়ালদা স্টেশনের কথা বলতেই মনে পড়ে যায়—চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই সব উদ্বাস্তু পরিবারের কথা। সেই রকম পরিবারেরই এক উদ্বাস্তু কবিয়ালের গান, রণেনদার কাছেই শেখা—

'বাউল বাউল কর সবাই ও
ও বলো বাংলার বাউল গাইবে কে?
বড় দুঃখ পাইয়া বাংলার বাউল মইরাছে'

রণেনদার কাছে এভাবেই আমার গান শেখা। বেশির ভাগ মানুষেরই একটা স্বাভাবিক উচ্চাশা থাকে। শিল্প সংস্কৃতি, রাজনীতি যে ক্ষেত্রেই হোক। একজন চাকুরিজীবীরও পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় থাকতে হয়, বড় বাবুকে খুশি রাখতে হয়। প্রতিযোগিতা থাকলেই হিংসা দ্বেষ। কিন্তু রণেনদার জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই উচ্চাশা বলে কিছু ছিল না। আর ছিল না বলেই—হতাশা, পরশ্রীকাতরতা কোনোটিই তাঁর ছিল না।

রণেনদার কাছে সবচেয়ে অসহ্য ছিল অযাচিত করুণা ও স্তুতি। আর তাই তেমন কোনো

পরিস্থিতিতে খুব বিগড়ে গেলে অনেককেই তাঁর চার-অক্ষরের সংবর্ধনা নিতে হয়েছে। অসহ্যের তালিকার আরও অনেক কিছুর মধ্যে আর একটা জিনিস ছিল। তা হোলো টেপরেকর্ডার। হয়তো কোনো গবেষক বগলে একখানা টেপরেকর্ডার নিয়ে রণেনদার কাছে হাজির—'দাদা আপনার কথা অনেক শুনেছি...আপনার মতো লোক...'।

রেগে গেলে রণেনদা অনেক সময় মাথা গরম না করে উল্টে মজা করে পেছনে লাগতেন। 'বুজেছি আপনে কি জন্য এ্যাসেছেন বলেন।' 'আমি ভাটিয়ালী গানের উপর একটা ফেলোশিপ নিয়ে...।' 'আপনে রিচাস করছেন? ডাক্তার হোবেন? শহরে বসে বসে লুকসঙ্গীত চাষ হবে? বেশ বেশ...।'—এই ভাবে ভদ্রলোককে বোর করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যেতেন যে ভদ্রলোক ছেড়ে দাও মাগো পালিয়ে বাঁচি।

আসলে আমি প্রথম থেকেই যেটা অনুভব করতাম যেটা হচ্ছে রণেনদার মতো মানুষের গান, সেই মানুষটাকে বাদ দিয়ে—এটা কখনই ভাবা যায় না। গানটা কি শুধুই একটা গান! মানুষটার কোনো অস্তিত্ব নেই! যার হৃদয় জুড়ে জীবন জুড়ে গান! একবার রেকর্ড করে নিলাম, ব্যাস! তারপর আর তার প্রয়োজন নেই। সুইচ টিপবো আর গান শুনবো। কি মজা।

যন্ত্রস্থ করা গান তো একটা কূপের মতো—আবদ্ধ। তার কোনো নিত্যনতুন ঢেউ নেই। কোনো দোলা নেই। পড়া নামতার মতো একই রকম। কিন্তু সশরীরে একটা মানুষের গান যেন তার জীবনের। যে গান যন্ত্রের কাছে নয় একটা মানুষের কাছে। একেকটা দিন একেক রঙে ধরা দেয়। যেন ঝর্ণার মতো। পাত্রে ধরে রাখা— সে তো ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু এই যে গাইলাম, নিজের আনন্দ সবাইকে বিলিয়ে দিলাম। এই আনন্দই তো পরমানন্দ। এই তো জীবনের পাওয়া।

বিভিন্ন জনের কাছ থেকে রণেনদার গাওয়া বেশ কিছু গান পাওয়া গেছে শুনলাম। তাঁরা রণেনদার খুব কাছের ছিলেন বলেই হয়তো রণেনদা রেহাই পাননি। কিন্তু শুনলাম সকলের রেকর্ড করা গানের মধ্যে অধিকাংশই পুনরাবৃত্তি। তাই বোঝাই যায় যে রণেনদা খুব একটা আগ্রহ নিয়ে গানগুলো গান নি। তা হলে পঁচিশ-তিরিশটা গানের বাইরে যে আরও অসংখ্য গান রয়েছে সেগুলোও শুনতে পেতাম। এই না পাওয়ার যন্ত্রণাও এক অনুভূতি। এক উপলব্ধি।

রণেনদার মতো মানুষের হৃদয়ে যে কি করে আমি এতোটা জায়গা করে নিয়েছিলাম—আজও ভাবতে অবাক লাগে। হয়তো বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি। একটা চিঠি: '...স্বপন তোমাকে অনেক দিন দেখি না। কাল রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম, ...মনটা ভালো নেই। তুমি ভালো আছো তো।' আমার বাবা যখন চলে গেলেন, একটা অসাধারণ চিঠি দিয়েছিলেন রণেনদা। অন্য কারোর ব্যথা একেবারে নিজের করে অনুভব করতেন। এমনই একজন প্রাণের মানুষ, যাকে আমি চিরকালের জন্য হারিয়েছি। তাঁর অভাব কোনো দিনই পূর্ণ হবার নয়। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় সম্বল তাঁর গান, তাই আজও সেই ভালোবাসা খুঁজে বেড়াই—'প্রাণবন্ধু কইগো'।

রণেনদার জীবনে ঋত্বিক ঘটক একটা বিশেষ অধ্যায়। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের একটা মজার ঘটনা শুনেছি। বিশেষ সূত্রে ঋত্বিক ঘটকের ডাক পেয়ে রণেনদা স্টুডিওতে উপস্থিত। ভেতরে তখন কাজ চলছিল। বাইরে অনেকে তখন বসে আছেন। একসময় যথারীতি

ধৈর্য্যচ্যুতি। একজনকে ডেকে বললেন,'শুনেন আমি চললাম'। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে 'বসুন বসুন এক্ষুনি দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক ঘটক রণেনদার সামনে এসে হাজির। তখনও রণেনদার গান শোনেন নি কিন্তু এটা বুঝেছেন যে এ তাঁর চেয়েও বড় ক্ষ্যাপা। তাই হ্যাপা না বাড়িয়ে 'আসুন আসুন ভেতরে আসুন'। রণেনদা বললেন, 'দ্যাখেন, আমার কাছে যে গান আছে তা আপনের ছবিতে কুনো কাজে লাগবে কিনা দ্যাখেন, আমার তাড়াতাড়ি ছ্যাড়ে দেন'। তারপর শুরু হল রণেনদার গান, কটা গানের পর থামলেন জানা নেই।

ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে রণেনদার গান, আমাদের বাংলা সংস্কৃতির এক পরম সম্পদ। যা আমাদের হাজার বছরের মানুষকে চিনিয়ে দেবে, আমাদের মাটি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের প্রেম, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের ভালবাসা—এই একটা ব্যাপারে আমরা সকলে রণেনদার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। অনেক কিছু মুছে গেলেও থাকবে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে রণেনদার গান।

রণেনদার খুব কাছের এমন অনেক মানুষ আছেন আমি জানি, যাঁরা তেমন করে হয়তো বিখ্যাত নন, কিন্তু অসম্ভব গুণী ও বড় হৃদয়ের মানুষ। তেমন মানুষই রণেনদার জীবনে ভালবাসার ধন। সেই ভালবাসা বিফলে যায়নি। তাই আজ এতদিন বাদেও রণেনদার ভালবাসা তাজা ফুলের সুবাস নিয়ে বেঁচে আছে। তাঁর প্রিয়জনের হৃদয়ে, বুদ্ধদার মতো মানুষের হৃদয়ে। বুদ্ধদাকে (শ্রী বুদ্ধদেব সমাদ্দার) আমার প্রণাম। এই উদ্দেশে জড়ো হওয়া মানুষদের আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। আমাকে সঙ্গে রাখার জন্য জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

## চিত্তপটে রণেনদা

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

ডানলপ ব্রিজের পাশে বরাহনগর রোড স্টেশন। আজ থেকে ৩০/৩২ বছর আগে জায়গাটা একেবারেই নির্জন। সেখানে কোন এক বিকেলে, আপনি হয়তো দেখেছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে— কাঁচা পাকা বাবরি চুল, মুখভরা দাড়ি— তার মধ্যেও চোখে পড়ে তাঁর টিকলো নাক আর উজ্জ্বল গায়ের রঙ। অদ্ভুত উদাসী চোখ, লুঙ্গির মতো করে পড়া ধুতি আর ওপরে ফতুয়া বা পাঞ্জাবি— ছোটখাটো চেহারার এই মানুষটিই আমাদের রণেনদা—রণেন্দ্রবল্লভ রায়চৌধুরী। এরপর যদি পরিচয় করার সুযোগ হয় আপনার, দেখবেন কত সহজে অমায়িক হয়ে উঠছেন তিনি। আলাপের ফাঁকে নজরে পড়বে, কথা বলার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা আছে তাঁর—কথা আটকে যায়, একটানা বলা বার বার ব্যাহত হয়। আপনি চলে যাবার পর উনি বসবেন গিয়ে একটা বেঞ্চিতে, স্বগতোক্তির মত হয়তো গান ধরবেন একের পর এক। আড়াল থেকে যদি আপনি শোনেন, দেখবেন কথার বাধা সেখানে উধাও ! আকাশের উদাত্ততা আর সোঁদা মাটির গন্ধ আর নদীস্রোতের সাবলীলতা যেন একসঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে তাঁর কণ্ঠে। ভাবের ভাবী পাবার আশায় গান গেয়ে যান —'ভাঙা বাংলার ঘরছাড়া এক বাউল'— আমাদের রণেনদা।